একদিন ছুটি হবে

মাহবুব হাসান বাবর

একদিন ছুটি হবে
মাহবুব হাসান বাবর

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২২৫ টাকা

Ekdin Chuti Hobe by Mahbub Hassan Babor Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Marke: 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kan:abon Dhaka 1205 Firs: Edi:ion: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 225 Taka RS: 225 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Websi:e: kobibd.com

ISBN: 978-984-97557-1-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

পারমিতাদি
যে আমার জল

সূচিপত্র

একদিন ছুটি হবে ৯
তোমাকে চাই ১২
সে তোমাকে পাবে না ১৬
একদিন স্বপ্নের দিন ২৩
একমুঠো প্রেম ৪০
শেষ দৃশ্য ৪২
নিঃশব্দে একা ৪৮
পরাজিত প্রেম ৬৩
কেবিন নম্বর তিনশ তিন ৬৯

একদিন ছুটি হবে

ন'বছর ধরে চাকরিটা করার পর আজ তা ছেড়ে দিতে হলো। ছেড়ে দিতে হলো নিজের উপর রাগে-ক্ষোভে-কষ্টে।

আমার পঞ্চাশজন কলিগের ভেতর দু-চারজন ছাড়া সবাই ভালো।

তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মানবোধ কিংবা স্নেহময়তা আমাকে হয়তো আজ থেকে পীড়া দেবে।

কষ্ট পাবো এই ভেবে আমার গেটের দারোয়ান আমিন আমাকে দেখে মিষ্টি করে হেসে দিয়ে বলতো,

: স্যার আপনি সুস্থ আছেন তো? আজ ফজরের নামাজ পড়ে আপনার জন্য দোয়া করলাম।

অবশ্য তার দোয়া করার পেছনে একটা লম্বা কারণ আছে। কারণটা না হয় পরেই বলবো।

আমার অফিসের বড়বাবু মানে কেরানি বড্ড কড়া মেজাজের ছিল। তার হিসেবের খাতার স্বচ্ছতার কথা নাই বা বললাম তবে এটুকু বলতে পারি তার মেজাজের খাতা খুব কড়া।

তার মেজাজটা ঠিক সিনেমায় গোঁফওয়ালা দারোয়ানদের মতো। হয়তো বড়বাবুর এই হুমকি ধামকি আমার আর শুনতে হবে না।

যাহোক চাকরিটা করতে গিয়ে কত কাঠ-খড় পুড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নাই।

লাখ পাঁচেক টাকা দিয়ে চাকরিটা নেবার সময় বাবার পেনশনের পুরোটাই দিয়েছিলাম নিয়োগকর্তাদের হাতে।

সে টাকা দিয়ে তারা দুধে ভাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়েছে।

হয়তো জমিজমাও রেখেছে সে টাকা দিয়ে। বাবা যখন পোস্টাফিসের টাকাটা তুলে আনলো সেদিন সারারাত বাবা ঘুমায়নি।

সকালে ফজর নামাজ শেষে আবছা আলোতে আমার রুমে এসে কাপড়ের ব্যাগে টাকাটা নিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন।

: নে বাবা। সারাটা জীবন কষ্ট করে যে সঞ্চয়টা ছিল তা তোকে দিয়ে দিলাম। বাবার চোখে তখন জল।

আমি তখন নিথর-নিস্তব্ধ।

চাকরিটা পেয়ে ভাবলাম বাবার দেনাটা আস্তে আস্তে শোধ করে দেবো।

কিন্তু বেতনের টাকাটার সাথে জমানোর চিন্তাটা ছিল কাল্পনিক। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে মেলাতে গিয়ে বাবার টাকাটা হয়তো ফেরত দিতে পারবো কিনা জানি না। তারপরও ভাবছি আগে তো চাকরিটা হোক।

প্রথমদিন অফিস শেষে বাড়ি ফিরে বাবার মুখের দিকে তাকাতেই বুকটার ভেতর দুমড়েমুচড়ে যেতে থাকলো। কী নিষ্পাপ মুখ বাবার!

মা বেঁচে থাকতে আমার মনের কষ্ট কিংবা সুখ সবটাই সে বুঝতে পারতো। ছোট বোনটার বিয়ের সময় মা তার হাত ধরে বললো, আমি না থাকলে রতনকে দেখে রাখিস।

ছোট বোনের বিয়ের তিনমাসের মাথায় হঠাৎ মা মারা গেলেন। আমাদের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল।

বাবা আর আমি এই নিয়েই সংসার চলছিল। মেজ চাচির আবদার বাবা যতদিন বেঁচে থাকবেন তাদের ভেতরই খাবেন পরবেন।

এবার বাবার টালবাহানা বিয়ে কর। কিন্তু বেকার ছেলে– অসমাপ্ত লেখাপড়া এসব নিয়ে এগুলো হবে না। স্রেফ জানিয়ে দিলাম।

ছোট বোন এসে কিছুদিন থেকে রান্নাবান্না করলেও শ্বশুরবাড়ির চাপে সেও চলে গেল। এবার নিকটাত্মীয়দের অনুনয় বিনয় বিয়ে কর।

আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। আমার আর বাবার খাবার মেজ চাচিদের ঘর থেকেই চলছিল।

তারপর যখন চাকরিটা হতে যাচ্ছে বাবার পেনশনের জমানো টাকাটা ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিলাম তখন কী এক কষ্ট তা মনে পড়লে বুকটা ছিঁড়ে যায়। মনে হচ্ছিলো বাবাকে বিক্রি করছি। মনে হচ্ছিলো বাবার হাসিমুখ বিক্রি করছি।

চাকরিটা পাবার একমাস পর যখন একুশ হাজার পাঁচশত টাকা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ঠিক তখন ভাবলাম টাকাটা বাবার হাতে দিয়ে চিৎকার করে কাঁদবো।

হঠাৎ ছোটচাচার ফোন।

: রতন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে পারবি। ভাইজান তো খুবই অসুস্থ। অজ্ঞান হয়ে গেছে। কথা বলছে না।

আমি হেড স্যারকে বলে দ্রুত বাড়ি যেতে যেতে চাচার আবার ফোন।

: রতন বাড়ি আসতে হবে না। ভাইজানকে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি। তুই হসপিটালে আয়।

আমার থেকে হসপিটাল এখন সাত কিলো দূরে। গ্রামীণ এমন পরিবেশে অটোরিকশাই ভরসা। অটোরিকশাকে বারবার তাগিদ দিচ্ছি দ্রুত যেতে।

আধঘণ্টা পর হসপিটালের গেটে আসতেই আবার চাচার ফোন। চাচা কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে দ্রুত আসতে বললো।

অটো থেকে নেমে ফোনে চাচাকে বললাম,

: চাচা আপনারা কোথায়?

চাচা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,

: জরুরি বিভাগে আয়।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জরুরি বিভাগে ঢুকতে বাবার দিকে তাকাতেই দেখি তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরতেই ডাক্তার বললেন,

: মৃত মানুষকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে নেই। শান্ত হন ভাই।

আমি হাউমাউ করে কাঁদছি। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

জানি না কখন জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফেরার পর আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম বাবার শোয়ানো টেবিলটার পাশের টেবিলে।

আমি পাশ ফিরতেই দেখি বাবাকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

আমার পকেটে একুশ হাজার পাঁচশত টাকা।

ঐ টাকাটা তখন খুব ভারী লাগছিল। টাকাটার ভার আমি সইতে পারছিলাম না।

হসপিটাল থেকে বাড়িতে যাবার আগেই বাবার কাফনের কাপড় ও অন্যান্য সবকিছু কেনার জন্য পুরো টাকাটা মেজ চাচার হাতে দিলাম।

আজ বাবার দেয়া সেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাবো জানি না। বাবার কথা মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। মার কথাও মনে পড়ছে। মা-বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো তাদের কাছেই যেতাম।

হঠাৎ এত বছর পর যার জন্য আজও আমি সংসারি হইনি সেই হৃদির কথা মনে পড়লো। বারবার হৃদিকে ভুলে বাবার অবয়ব আনতেই পেছন থেকে কে যেন ডেকে বললো,

: রুদ্র!!!

ফিরে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না।

আমি এখন হাঁটছি– শুধুই হাঁটছি। আমার গন্তব্য এখন বাবা-মায়ের কবরের সীমানায়। আমারও একদিন ছুটি হবে। সে ছুটিতে বাবা-মার কাছে যাবো। তাদের বুকে মাথা রেখে আজন্ম ঘুমাবো।

তোমাকে চাই

মিথিলার হাত ছুঁয়ে বারবার কান্না করছে প্রিতম। অথচ সে হাত সরিয়ে দিচ্ছে মিথিলা। চোখে মুখে মিথিলার কোনো উত্তাপ নেই। বরং তার চেহারার ভেতর কী এক বিরক্তি আর অসহ্য ভাব।

এই মিথিলা একসময় প্রিতমের জন্য পাগল ছিল। একটি দিন দেখা না হলে কী সব পাগলামি করতো।

কাঁদতে কাঁদতে সারারাত কাটিয়ে দিতো। ফোনে সারারাত কান্নার সাথে কত আবেগী কথাযে বলতো।

ক্লাসের সময়টুকু বাদে ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বরে প্রিতমের হাত ধরে থাকতো বলে ক্লাসের সহপাঠীরা দুষ্টুমি করে বলতো,

: কিরে মিথিলা তুই কি জন্মান্ধ নাকি! সারাক্ষণ প্রিতমের হাত ধরে থাকিস।

মিথিলা হাসতো। প্রিতমের গর্ব হতো মিথিলাকে নিয়ে। এমন ভালোবাসা কজনের ভাগ্য জোটে।

শহরের দর্শনীয় স্থান, নাটকপাড়া, মেলা এবং বিভিন্ন দিবসগুলোতে ম্যাচিং ড্রেস সত্যিই দৃষ্টি কাড়তো সবার।

মিথিলার চেহারার ভেতর মায়াবি আর ইনোসেন্ট ভাব ছিল। ধনী বাবার মেয়ের আবদারের আগেই পূরণ করতো ফ্যামিলি। প্রিতম ভালো গান গাইতো। ইউনিভার্সিটির সব প্রোগ্রামে গান করতো সে। এ যুগের ছেলে হলেও ব্যান্ড কিংবা হাই মিউজিক্যাল গান গাইতো না। সত্তর কিংবা আশি দশকের জনপ্রিয় আধুনিক গান বা সিনেমার গান করতো। আর মিথিলা বেশ লেখালেখি করতো।

গত বছর পহেলা ফাল্গুনে গান গাওয়া শেষে প্রিতম স্টেজ থেকে নামার পর এক মেয়ে একটা ফুল গিফট করতেই কী হুলোস্থুল কাণ্ড ঘটালো মিথিলা।

প্রিতম এখন খুব কাঁদছে। মিথিলা প্রিতমের হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। পেছনে না তাকিয়ে খটখট শব্দ করে চলে যাচ্ছে। প্রিতম ভেজাচোখে তার চলে যাওয়া দেখছে...শুধুই দেখছে।

সকালের স্নিগ্ধতা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে মিথিলা। আজ বিকেল পাঁচটায় তার ফ্লাইট। গতরাতে ব্যাগেজ গোছানোর কাজটি নিজেই করেছে। ঘুম থেকে জেগে

গুনগুন করে গান গাইছে। পেছন থেকে আমেরিকা প্রবাসী স্বামী তাকে জাপটে ধরে।

মিথিলা আহ্লাদি কণ্ঠে বলে,

: এই ছাড়ো! কেউ দেখবে তো।

পেছন থেকে স্বামী বলে ওঠে,

: না ছাড়বো না। তোমাকে আজ ভীষণ অন্যরকম লাগছে।

হঠাৎ কাজের মেয়ের ডাকে দুজন দুদিকে ছিটকে যায়। দেয়ালে চোখ পড়তেই প্রিতমের দেয়া একটি ওয়াল পিকচারে চোখ গিয়ে আটকে যায়। দেড়মাস আগে যে প্রিতমের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল, সে মিথিলা হঠাৎ বিয়ে করে প্রিতমকে ভুলে গেছে।

প্রিতমের কথা মনেই নেই। ভাবটা এমন যেন কস্মিনকালেও প্রিতমকে চেনে না।

কাজের মেয়ের হাতে চা। মিথিলা তাকে বললো,

: রহিমা চা নিয়ে যা। এখন চা খাবো না।

মিথিলার স্বামী আড়চোখে তাকিয়ে বললো,

: মিথিলা তোমার কি মন খারাপ?

না তো কেন! মিথিলা হেসে বললো।

হঠাৎ জানালার দিকে তাকাতেই দেখে গলির মোড়ে প্রিতম দাঁড়িয়ে আছে। দোতলার দক্ষিণের ঠিক ওর জানালার দিকে তাকানো। মিথিলা একবার তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রিতমের চোখ দিয়ে জল পড়ছে তা মিথিলা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এদিকে মিথিলার স্বামী আস্তে আস্তে জানালার কাছে আসতে থাকলো।

জানালার কাছে আসার আগেই মিথিলা মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

মিথিলার স্বামীর চিৎকার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে মা আর কাজের মেয়ে ছুটে এসেছে। মা এসে কান্নাকাটি করতে লাগলো।

মিথিলাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে। বালতিতে করে পানি এনেছে নাছিমা। মিনিট তিনেক পরেই মিথিলা চোখ মেলে তাকালো। চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ শোয়া থেকে বসে পড়লো। তার মা তাকে জড়িয়ে ধরলো। মিথিলা খুব আস্তে করে বললো,

: কী হয়েছে আমার?

মিথিলার স্বামী বললো,

: তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে।

মিথিলা বিছানা থেকে নামতে গেলে তার স্বামী বাধা দিলো। সে বললো,

: তুমি উঠছো কেন! তুমি অসুস্থ। আবার মাথাঘুরে পড়ে যাবে।

মিথিলা মৃদু হেসে বললো,

: না কিছু হবে না। সকালে নাস্তা করিনি তো তাই হয়তো এমন হয়েছে।

মিথিলার মা নাছিমাকে ধমক দিয়ে এখানে খাবার আনতে বললেন। মিথিলা বললো,

: না মা এখানে আনতে হবে না। আমি ডাইনিংয়ে গিয়ে খাচ্ছি।

মা বললেন,

: এ শরীর নিয়ে বিকেলের ফ্লাইটে কী করে যাবি।

জামাইর দিকে তাকিয়ে বললেন,

: বাবা ফ্লাইট কি চেঞ্জ করা যায়?

মিথিলা বললো,

: না মা আমি ঠিক আছি। ফ্লাইট চেঞ্জ করতে হবেনা।

বিদেশে থাকা মানুষগুলো কিছুটা বউ পাগল কিছিমের হয়ে থাকে।

মিথিলার স্বামী হঠাৎ করে মিথিলাকে এসে জড়িয়ে ধরে বললো,

না মিথিলা তোমার শরীর ভালো না। টিকেটের টাকা যায় যাক, তোমাকে এভাবে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

মিথিলা একসময় ভালো লিখতো। একদিন কোন এক দেয়াল পত্রিকায় তার লেখাটা নিয়ে হৈচৈ লেগে গিয়েছিল। ছোট্ট কয়েকটি কবিতার লাইন যার ভাবার্থটা দারুণ রোমাঞ্চকর এবং বিষাদ আর বিরহের চাদরে আলোর আস্ফালন। সবচেয়ে মজার ছিল কবিতাটি বিপরীত মেরুর। যে কবিতার কথাগুলো প্রিতমের কিন্তু অনুভূতিগুলো মিথিলার।

"খুব ভালো লেখে মেয়েটি। রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তির মতো দেখতে। লাজুক চোখে যখন তাকায় তখন ঘোর বর্ষা নামে চোখে। প্রিয় আবৃত্তিকার নাকি আমি। আমার কবিতা পড়ে– আমার কবিতা শোনে। ডায়মন্ডের চিকন ফ্রেমের আংটিটা উপহার দেবার দিন একগুচ্ছ গোলাপের সাথে তেত্রিশ হাজার টাকার চকচকে নোটগুলো আমার হাতে গুজে দিয়েছিল।

মেদহীন শরীরে জড়িয়ে ধরেলে আমার শরীরে ঘোর নামে।

আমাকে এতটাই ভালোবেসে প্রতীক্ষা করে অনবরত। আমি এড়িয়ে চলি। সে আমাকে পাবে না– আমি যেমন তোমাকে পাবো না।

তবে কোন এক মাসের এক তারিখ থেকে আমি তার হবো।"

মিথিলার এমন লেখা একটি ছেলের হয়ে কোনো এক তপতি কন্যার চোখে মুখে উত্তাপ ছড়ানো। আজ প্রিতমের কাছে কেবলই স্মৃতি। সেই ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বর আজও কবিতার মতো উদভ্রান্ত।

প্রিতমের মনের ভেতর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আজ মিথিলা চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছে। জীবনের এমন আচমকা মোড় কীভাবে সয়ে

নেবে প্রিতম তা জানে না। কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হওয়া কবিতাগুলো বারবার পড়তে পড়তে একসময় চিৎকার করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ভেতরও মিথিলাকে নিয়ে জাবর কাটে। শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেলে শোয়া থেকে উঠে বসে।

কী যেন ভেবে দরজা খুলে বাইরে চলে আসে। রাস্তায় তখন আবছা আলো ফুটেছে। হাঁটতে হাঁটতে প্রিতম কোথায় চলে যাচ্ছে কেউ তা জানে না। একসময় আলো ফোটে আর প্রিতম শূন্যে মিলিয়ে যায়।

[প্রিয় পাঠক, প্রিতমকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি– কিন্তু মিথিলাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল কোনো এক তপ্ত দুপুরে তার লেখা কবিতার হৈমন্তির চরিত্রে।]

সে তোমাকে পাবে না

রাজ এখন একা। স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারেনি অনুর স্মৃতিচিহ্ন। সে মাঝে মাঝে দোতলা বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাতে ভরা পূর্ণিমা দেখে। দেখে বৃষ্টির মিহিদানা। সবকিছুর ভেতর সে অনুকে খোঁজে।

হারিয়ে যাওয়া অনুর জন্যে আজও সুন্দরের দিকে পথ চেয়ে থাকে।

অনু তখন সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। যথেষ্ট মেধাবী মেয়েটি সহজেই টিচারদের দৃষ্টিতে পড়লো। গান আবৃত্তিতেও অসাধারণ। চেহারার মিষ্টতা আর চঞ্চলতা তাকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের খুব কাছে নিয়ে গেল সহজেই।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে লাল শাড়িতে পরির মতো লাগছিল। দূর থেকে বারবার তাকাচ্ছিল রাজ। চোখে চোখ পড়ছিল অনুরও। রাজ অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে। কলেজে ভর্তি হবার পর বেশ কবার কথাও হয়েছে ওর সাথে। দুজন দুজনকে বেশ পছন্দই করতো।

বারবার চোখ পড়াতে অনু বিব্রত হচ্ছিল। তবে একটু আধটু রোমান্সও অনুভব করছিল।

অনুষ্ঠান চলছে। দর্শকদের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে শিল্পীরা। হঠাৎ উপস্থাপক গান গাইতে আহ্বান করলো সারিকা রহমান অনুকে। অনু মঞ্চে চলে গেল। মিউজিক শুরু হলো। মঞ্চ থেকে সোজা চোখ গেল রাজের দিকে। রাজ এবার আঁটসাঁট হয়ে বসলো। চোখেমুখে তৃপ্তির উত্তাপ। তার প্রিয় মানুষটি মঞ্চে। গান শুরু হলো, অর্ডিয়েন্সও উপভোগ করছে রোমান্টিক ধাঁচের গান। আর করবেই বা না কেন। দর্শক তো সবই টিনএজ প্রায়।

যাহোক অনুষ্ঠান রীতিমতো শেষ হলো। সবাই চলে যেতে থাকলো। অনুও কলেজ থেকে বের হচ্ছে এমন সময় রাজ পেছন থেকে ডাকলো,

: অনু এই অনু একটু শুনবে!

অনু পেছন ফিরে তাকালো। বিস্মিত চোখে দাঁড়ালো।

: কিছু বলবেন?

: হ্যাঁ অনু। তোমার গানের তো ভক্ত হয়ে গেলাম। এত সুন্দর গাও তা তো জানতাম না। আর না বলেই বা যাচ্ছ কেন?

: সুন্দর না ছাই। এটা কোনো গান হলো! আর আপনি আমার কে যে বলে যেতে হবে! কথাটি বলেই সে কাচভাঙা শব্দের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো।

: আরে অসম্ভব সুন্দর হয়েছে। শোনো তোমার গান কিন্তু আরেকদিন শোনাতে